بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা (রাঃ)-র ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১লাফেব্রুয়ারী ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা। তিনি দীর্ঘকায় ও সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। মহানবী (সা.) এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, আবু হুযায়ফা বিন উতবা বনু উমাইয়া গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল উতবা বিন রাবিয়া। তিনিকুরাইশ নেতাদের একজন ছিলেন। আবু হুযায়ফা ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন, যা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে মুসায়লামা কাযযাব এর বিরুদ্ধে লড়া হয়েছিল। হযরত আবু হুযায়ফা ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতে অংশ নিয়েছেন। তার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহায়লও তার সাথে হিজরত করেছেন।

মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, আর কুরাইশদের নির্যাতন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, ইথিওপিয়ার বাদশা ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক, তার রাজত্বে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। যাহোক মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়,তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। মহানবী (সা.) এর নির্দেশে পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে ১১জন পুরুষ এবং ৪জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করে। আবু হুযায়ফা বিন উতবাএখন যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে- ইনিও প্রথম হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই মুহাজেররা দক্ষিণ দিকে সফর করে যখন সুআয়বা পৌঁছে, যা সে যুগে আরবদের একটি সামুদ্রিক বন্দর ছিল, তখন খোদার এমন কৃপা হয় যে, তারা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যায় যা ইথিওপিয়া অভিমুখে যাত্রার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। তারা সেই জাহাজে আরোহন করে। ইথিওপিয়া পৌঁছে মুসলমানরা খুবই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনে ধন্য হয়। আল্লাহ্‌র কৃপায় কুরাইশদের নির্যাতন থেকে নিস্তার লাভ হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই মুহাজেরদের ইথিওপিয়া যাওয়ার স্বল্পকাল পরেই তাদের কাছে এই উড়োখবর পৌঁছে যে,সব কুরাইশ মুসলমান হয়ে গেছে,আর মক্কা এখন শান্তিধামে রূপ নিয়েছে। এই খবরের ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো- বেশিরভাগ মুহাজের অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করেই ফিরে আসে।

কিন্তু তারা যখন মক্কার কাছে পৌঁছল তখন সত্য জানা গেল আর বাস্তবতা সম্পর্কে তারা অবহিত হলো। তখন তাদের কতক গোপনে আর কতক কিছু শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী কুরাইশ নেতার আশ্রয় ও নিরাপত্তায় মক্কায় এসে যায়। আর কিছু ফিরে যায়। যাহোক ইথিওপিয়ার মুহাজেররা ফিরে আসলেও তাদের অধিকাংশই আবার ফিরে যান, কেননা কুরাইশরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নিপীড়নে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। আর তাদের নির্যাতনও প্রত্যহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাই মহানবী (সা.) এর নির্দেশে অন্যান্য মুসলমানরাও সংগোপনে হিজরতের প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করে। আর সুযোগ বুঝে তারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে থাকে। এই হিজরত এমনভাবে আরম্ভ হয় যে, অবশেষে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ১০০ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যাদের মাঝে ১৮জন মহিলাও ছিল। আর মক্কায় মহানবী (সা.) এর সাথে খুব স্বল্পসংখ্যক মুসলমান রয়ে যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই হিজরতকে ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত আখ্যায়িত করে থাকে। একইভাবে পরবর্তীতে যখন মদীনায় হিজরতের অনুমতি লাভ হয়,তখন আবু হুযায়ফা এবং তার মুক্ত কৃতদাস সালেম উভয়েই মদীনায় হিজরত করেন। যেখানে তারা উভয়েই আব্বাদ বিন বিশরের ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু হুযায়ফা এবং আব্বাদ বিন বিশরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত আবু হুযায়ফা আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ নামক সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানেও যোগদান করেছেন। আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ-এর সারিয়া বা যুদ্ধাভিযানের পটভূমি এবং কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,এখন সেটি উপস্থাপন করছি। মক্কার এক নেতা কুরয বিন জাবের বিন ফেহরী কুরাইশী একটি সৈন্যদলের সাথে চরম ধূর্ততার সাথে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী একটি চারণভূমিতে আকস্মিকভাবে হামলা করে আর মুসলমানদের উট বা গবাদিপশু লুটপাট করে। এর সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসাকে তাঁর (সা.) অবর্তমানে আমীর নিযুক্ত করে মুহাজেরদের একটি দলকে সাথে নিয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন আর বদরের অদূরবর্তী একটি জায়গা

সাফওয়ান পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সেহাত ফসকে বেরিয়ে যায়। এই যুদ্ধকে **'গাযওয়ায়ে বদর আলউলা'** (অর্থাৎ বদরের প্রথম যুদ্ধ) বলা হয়। তিনি আরো লিখেন যে, কুরয বিন জাবের-এর এই হামলা কোন মরুবাসীর বিচ্ছিন্ন হামলা ছিল না বা অজ্ঞতাবশত শুধু চুরি-ডাকাতির মানসে হামলা ছিল না, বরং সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিশেষ দুরভিসন্ধি নিয়ে এসেছিল। এটি একেবারেই অসম্ভব নয় যে, বিশেষত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার ওপর হামলা-ই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসলমানদেরকে চৌকস পেয়ে সে তাদের উট নিয়ে পালিয়ে যায়। এর মাধ্যমে এটিও বুঝা যায় যে, কুরাইশরা মদীনায় গুপ্ত হামলার মাধ্যমে মুসলমানদের ধ্বংস করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। কুরয বিন জাবের এর আকস্মিক হামলা স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদেরকে খুবই ভীতবিহ্বল এবং হতভম্ব করে তোলে। আর কুরাইশ নেতাদের হুমকি-ধমকি যেহেতু পূর্বেই ছিল যে, আমরা মদীনায় হামলা করবআর মুসলমানদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করব, তাই মুসলমানরা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এসব আশঙ্কা দেখে মহানবী (সা.) কুরাইশদের গতিবিধি খুব কাছে থেকে দেখা বা অবগত হওয়ার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হন যে, দেখা যাক তাদের পরিকল্পনা কী আর দুরভিসন্ধি কী। আর তা উদঘাটনের জন্য এমন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত যেন খুব কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে খবরাখবর আসতে থাকে এবং সময়মত সংবাদ লাভ হয়। আর মদীনার ওপর যে কোন হামলা থেকে যেন একে নিরাপদ রাখা যায়। এই লক্ষ্যে তিনি (সা.) ৮জন মুহাজেরের সমন্বয়ে একটি সেনাদল প্রস্তুত করেন। আর কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই সেনাদলে এমন লোকদের অন্তর্ভু ক্ত করেন যারা কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো। যেন কুরাইশের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। তিনি (সা.) নিজের ফুপাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশকে এই সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেন। এই সেনাদলে হুযায়ফা বিন উতবাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দুদিনের সফর অতিক্রম করার পর আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.) এর পত্র খুলে দেখেন। তাতে এই কথা লিপিবদ্ধ ছিল যে, তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা উপত্যকায় যাও। সেখানে গিয়ে কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহ কর আর আমাদেরকে অবহিত কর। যেহেতু মক্কার এতটা কাছে থেকে খবর সংগ্রহ করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার ছিল তাই তিনি (সা.) পত্রের শেষের দিকে এই দিক-নির্দেশনাও লিখে দিয়েছিলেন যে, এই মিশন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তোমার কোন সাথি যদি এই সেনাদলের অংশ হতে দ্বিধা করে এবং সে যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিবে। আব্দুল্লাহ্তার সাথিদেরকে মহানবী (সা.) এর দিক-নির্দেশনা শুনিয়ে দেন। তখন সবাই সমস্বরে ও সানন্দে এই সেবার জন্য আত্মনিবেদন করে এবং বলে যে, আমরা উপস্থিত। অতঃপর এই সেনাদল নাখলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সাদ বিন আবি ওক্কাস এবং উতবা বিন গাযওয়ান-এর উট হারিয়ে যায়, তারা এর সন্ধানে নিজ সাথিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অনেক সন্ধান করেও তাদেরকে পাওয়া যায় নি। এখন এটি কেবল ছয় সদস্যের একটি সেনাদল হয়ে যায়। এই ছয় ব্যক্তি নিজেদের মিশন বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে থাকে। মুসলমানদের এই ছোট্ট জামাতটি নাখলা পৌঁছে আর নিজেদের কাজে রত হয়, অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অভিপ্রায় কী, মদীনায় হামলা করার কোন দুরভিসন্ধি আছে কিনা, বা কী ষড়যন্ত্র করছে- তা জানার কাজে রত হয়। তাদের কেউ কেউ গোপনীয়তা রক্ষার মানসে মাথার চুল কামিয়ে ফেলে, যেন পথিকরা তাদেরকে উমরাহ্-র উদ্দেশ্যে আগত মনে করে কোন সন্দেহ না করে। অর্থাৎ তারা যেন এটি মনে করে যে, এরা উমরাহ্-র জন্য যাচ্ছে। কিন্তু বলা হয় যে, তাদের সেখানে পৌঁছার পর খুব একটা সময় কাটে নি, হঠাৎ সেখানে কুরাইশদেরও একটি ছোট্ট কাফেলা পৌঁছে যায়, যারা তায়েফ থকে মক্কা যাচ্ছিলআর উভয় দল মুখোমুখি হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন তারা জানতে পারে যে, এরা মুসলমান তখন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। মুসলমানরা নিজেদের কর্মপন্থা সম্পর্কে পরস্পর পরামর্শ করে, কেননা মহানবী (সা.)তাদেরকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো ইতোমধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে আর এখন দুই শত্রুদল মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। এছাড়া স্বভাবতই এই আশঙ্কাও ছিল যে, কুরাইশ কাফেলা যেহেতু মুসলমানদের চিনে ফেলেছে তাই এই খবর সংগ্রহের বিষয়টিও গোপন থাকবে না। সেই সাথে আরেকটি সমস্যা এটিও ছিল যে, কিছু মুসলমানের ধারণা ছিল, এটি রজব মাসের দিন অর্থাৎ পবিত্র মাসগুলোর সমাপ্তি। যে পবিত্র মাসগুলোতে আরবের রীতি অনুসারে যুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল না। পক্ষান্তরে নাখলা উপত্যকা একান্ত হারাম শরীফের সীমানায় অবস্থিত ছিল। স্পষ্টতই আজই যদি কোন সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে কাল এই কাফেলা হারামে প্রবেশ করবে। যার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা আবশ্যক। এক কথায় এসব কথা চিন্তা করে সেই ছয়জন মুসলমান এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, কাফেলার ওপর হামলা করে হয় তাদেরকে বন্দি করা উচিত অথবা হত্যা করা উচিত। অতএবতারা আল্লাহ্র নাম নিয়ে হামলা করে। ফলশ্রুতি স্বরূপ আমের বিন আলহাজরামি নামক কাফেরদের এক ব্যক্তি মারা যায় আর দুজন ধরা পড়ে। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি হাত ফস্কে বেরিয়ে যায়। মুসলমানরা তাকে বন্দি করতে পারে নি। আর এভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা বন্দি করার এই প্রস্তাব সফল হয়েও হলো না। এরপর মুসলমানরা কাফেলার সাজসরঞ্জাম হস্তগত করে। কুরাইশদের একজন যেহেতু প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেছে। আর এটি নিশ্চত ছিল যে, এই সংঘর্ষের সংবাদ অচিরেই মক্কায় পৌঁছে যাবে, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সাথিরা গনিমতের মাল নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

যাহোক সত্য কথা হলো মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন যে, সাহাবীরা কাফেলার ওপর হামলা করেছে, তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন।

ঘটনার বর্ণনা অনুসারে যখন এই দলটি মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয় আর তিনি যখন পুরো বৃত্তান্ত অবগত হন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দিইনি। এমনকি তিনি (সা.) গনিমতের মাল নিতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি (সা.) বলেন যে, এটি থেকে আমি কিছুই নিব না। এতে আব্দুল্লাহ্ এবং তার সাথিরা যারপরনাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। তারা ধরে নেন যে, আমরা খোদা এবং তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির ফলে এখন ধ্বংস হয়ে গেছি। তাদের হৃদয়ে গভীর ভীতি জাগে। অপরদিকে কুরাইশরাও হৈচৈ আরম্ভ করে যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে। অবশেষে কুরআনী আয়াত নাযেল হয়ে মুসলমানদের স্বস্তির কারণ হয়।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতারা নিজেদের হিংস্র অপপ্রচারকে পবিত্র মাসেও যথারীতি চালিয়ে যেতো। বরং এ মাসগুলোর ইজতেমা বা সম্মেলন এবং সফরকে কাজে লাগিয়ে তারা এসব মাসে নৈরাজ্যপূর্ণ কার্যকলাপে আরো ধৃষ্ট হয়ে উঠতো। অতএব এই উত্তরে, যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন, মুসলমানরা তো স্বস্তি পাওয়ার ছিলই, কুরাইশরাও কিছুটা বিরত হয় আর এরই মাঝে তাদের লোকেরা নিজেদের দুই জন বন্দিকে মুক্ত করানোর জন্য মদীনায় পৌঁছে যায়। তখন তিনি (সা.) ফিদিয়া বা মুক্তিপণ নিয়ে উভয় বন্দিকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু মদীনায় অবস্থানকালে এই উভয় ব্যক্তির মাঝে একজনের ওপর মহানবী (সা.) এর নৈতিক চরিত্র এবং ইসলামী শিক্ষার সত্যতার এমন গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, সে মুক্ত হয়েও ফিরে যেতে অস্বীকার করে আর মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করে এবং মুসলমান হয়ে তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়,আর অবশেষে বি'রে মঊনার সময় শহীদ হয়। তার নাম ছিল হাকাম বিন কিসান।

হুজুর (আইঃ) বলেন, হযরত আবু হুযায়ফা সম্পর্কে এটিও বলা হয় যে, বদরের যুদ্ধের দিন তিনি তার পিতার সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। তার পিতা মুসলমান ছিল না,কাফেরদের সাথে এসেছিল। তখন মহানবী (সা.) তাকে বাধা দেন এবং বলেন যে, তাকে ছেড়ে দাও, অন্য কেউ তাকে হত্যা করবে। অর্থাৎ অন্য কাউকে তার সাথে লড়াই করতে দাও। এরপর তার পিতা, চাচা, ভাই এবং ভাতিজাকে হত্যা করা হয়। তারা সবাই বদরের যুদ্ধেনিহত হয়। তিনি অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা অত্যন্ত ধৈর্য প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'লার সেই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যা তিনি মহানবী (সা.) এর সমর্থনে প্রদর্শন করেছিলেন, অর্থাৎ বিজয়। এই ঘটনা সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও পাওয়া যায় আর ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝ থেকে যার আব্বাসের সাথে যুদ্ধ হবে, সে যেন তাকে হত্যা না করে, কেননা তিনি বাধ্য হয়ে এসেছেন। তাই তাকে বন্দি করো, হত্যা করো না। যখন হযরত আবু হুযায়ফার কাছে এই কথা পৌঁছে বা কেউ তাকে অবহিত করে তখন মহানবী (সা.) এর সামনেনয় বরং কোথাও কোন সঙ্গীকে তিনি বলেন যে, আমরা কি নিজেদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দিব! এটি কেমন কথা। খোদার কসম, সেযদি আমার সামনে আসে তাহলে আমি অবশ্যই তার ওপর তরবারি চালাব। মহানবী (সা.) এর কাছে যখন এই কথা পৌঁছে তখন তিনি হযরত ওমরকে বলেন, ইয়া আবা হাফ্‌স! অর্থাৎ হে হাফ্‌সের পিতা, খোদার রসূলের চাচার চেহারায় তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে! হযরত ওমর হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার গলা কেটে দিব, খোদার কসম, যে এই কথা বলেছে তার মাঝে কপটতা দেখা যায়। হযরত আবু হুযায়ফা বলতেন, মহানবী (সা.) নিষেধ করেন যে, না, এমনটি হবে না। কিন্তু হযরত আবু হুযায়ফা ভুল বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলতেন যে, আমি সেদিন যে কথা বলেছি, তার ক্ষতি থেকে আমি নিরাপদ নই। আমি অনেক বড় এমন কথা বলে ফেলেছি, যে কারণে আমি স্বস্তিতে থাকতে পারবো না, আমি সর্বদা এর জন্য ভীত থাকব, কিন্তু শাহাদতের মৃত্যু আমাকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ যদি আমি ইসলামের জন্য শহীদ হই তাহলেই আমি মনে করব যে, যে কথা আমি বলেছি তার অনিষ্ট থেকে আমি নিরাপদ। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন।

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) নিহত মুশরিকদের একটি গর্তে বা কুয়ায় নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। তাদের সেখানে নিক্ষেপ করা হলে মহানবী (সা.) তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কূপবাসীরা! তোমারা কি তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছ যা তোমাদের মাবুদ অর্থাৎ প্রতিমা সমূহ তোমাদের সাথে করেছে। আমি তো নিশ্চিতভাবে সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছি যা আমার প্রভু আমার সাথে করেছেন। আর এখানে মাবুদ বলতে যদি আল্লাহ্ তা'লাকে বুঝানো হয় তাহলে এর অর্থ হলো তোমরা শাস্তি পাবে। যাহোক মহানবী (সা.) বলেন, আমি তো সেই প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছি যা আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ আমি তাদেরকে শাস্তি দিব আর তারা তোমার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। তখন মহানবী (সা.) এর সাহাবীরা নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আপনি কি তাদের সম্বোধন করছেন যারা মৃত! তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় এরা জেনে গেছে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য ছিল। মহানবী (সা.) এর নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয় তখন হযরত আবু হুযায়ফার চেহারায় অসন্তোষের ছাপ দেখা যায় কেননা তার পিতাকেও কুয়ায় নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তিনি (সা.) তাকে বলেন যে, হে আবু হুযায়ফা! খোদার কসম, এমন মনে হচ্ছে যেন তোমার পিতার সাথে যে ব্যবহার হচ্ছে তা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। মহানবী (সা.) হযরত আবু হুযায়ফাকে এই প্রশ্ন করেন। তখন হযরত আবু হুযায়ফা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)!

আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার পিতা নম্র, সত্যবাদী এবং সঠিক মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের মতে যা বুঝতেন সেটিকেই সঠিক মনে করতেন। কিন্তু তার মাঝে কোন অসত মনোভাব ছিল না। আর আমার বাসনা ছিল যেন আল্লাহ্ তা'লা তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু যখন আমি দেখলাম যে, এমনটি হওয়া এখন আর সম্ভব নয় আর তার সেই পরিণতি হয়েছে যা এখন হয়েছে, তখন এই বিষয়টি আমাকে দুঃখিত করেছে। মহানবী (সা.) তখন হযরত আবু হুযায়ফার জন্য কল্যাণের দোয়া করেন। হযরত আবু হুযায়ফা সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন। আর হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে ৫৩ বা ৫৪ বছর বয়সে তিনি শহীদ হন।

হুজুর (আই.) বলেন, এখন আমি আমাদের জামা'তের এক দীর্ঘদিনের সেবক ও বুযুর্গের স্মৃতিচারণ করব যিনি কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি হলেন প্রফেসর সঊদ আহ্মদ খান দেহলভীসাহেব। গত ২১ জানুয়ারী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি ইন্তেকাল করেছেন, **'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন'**। তার পিতা মুহাম্মদ হাসান আহসান দেহলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে তার দাদা পটিয়ালার শিক্ষক হযরত মাহমুদ হাসান খান সাহেবও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের ৩১৩জন সাহাবীদের তালিকার ৩০১ নম্বরে তার নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পটিয়ালায় শিক্ষক ও চাকরিরত মৌলভী মাহ্মুদ হাসান খান সাহেব। প্রফেসর সঊদ খান সাহেব ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে ওয়াকফ করেছিলেন। তিনি আলীগড় থেকে ফার্সিতে বিএ অনার্স করেছিলেন। তার সাথে তার ভাইদের ওয়াকফের উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৫৫ সনে একটি জুমুআর খুতবায় বলেন যে, আমি মনে করি মাস্টার মোহাম্মদ হাসান আহসান সাহেব এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা প্রশংসাযোগ্য। তিনি এক সাধারণ শিক্ষক ছিলেন এবং এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। তিনি উপোস করে করে নিজ সন্তানকে লেখাপড়া করিয়েছেন এবং তাকে গ্র্যাজুয়েট করিয়েছেন। আর সাত ছেলের মাঝে চার ছেলেকে জামা'তের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এখন তারা চার জনই ধর্মের সেবা করছে। আর তাদের প্রায় সবাই এমন নিষ্ঠার সাথে এই সেবা করছে যেমনটি ওয়াকফে জিন্দেগীর দায়িত্ব হয়ে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে ১৯৫০ সনে পশ্চিম আফ্রিকার ঘানায় ধর্মীয় সেবা করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ঘানার আহ্মদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল-এ প্রথম সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। এর জন্য ১৯৫০ সনের ৩০ এপ্রিল তিনি করাচী থেকে রওয়ানা হন এবং ৩০ জুন কুমাসি পৌঁছেন। অর্থাৎ মে এবং জুন এই দুই মাস সফর করে সেখানে পৌঁছেন। আজ আমরা পাঁচ-ছয় ঘন্টায় সেখানে পৌঁছে যাই। ১৯৫০ সনে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা এবং হল্যান্ড-এর জন্য আটজন আহমদী মুবাল্লেগ প্রেরণ সম্পর্কে আহমদীয়াতের ইতিহাসে তার নাম তালিকার শুরুতেই রয়েছে আর সেখানে ১ নম্বরে লেখা আছে যে, সঊদ আহমদ খান সাহেব, ঘানার উদ্দেশ্যে লাহোর থেকে যাত্রা ২৫ আমান ১৩২৯ হিজরী। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশে ১৯৫৮ সনে তিনি পাকিস্তানে আসেন আর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. করেন। ১৯৬১ সনে পুনরায় ঘানায় তার পদায়ন হয়, যেখানে তিনি আবারও পূর্ণ উদ্যমে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত ধর্মীয় সেবা অব্যাহত রাখেন। প্রফেসর সঊদ খান দেহলভী সাহেবের ছাত্রদের মাঝে ঘানার মোকাররম আব্দুল ওহাব আদম সাহেব এবং বি. কে. আডু সাহেবও ছিলেন, যিনি এখানে বসবাস করেছেন। ১৯৬৮ সনে পাকিস্তানে ফিরে আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) মোকাররম প্রফেসর সঊদ আহমদ খান দেহলভী সাহেবকে তালীমুল ইসলাম কলেজে ১৯৬৯ সনে পাঠদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

হুজুর (আই.) বলেন, তার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে বাস্তবে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তার গুণাবলী তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। খিলাফতের সাথে পরম ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল আর অসাধারণ মান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান এবং বংশপ্রজন্মকেও খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখুন এবং তার মর্যাদা অনবরত উন্নীত করুন। নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 1st February 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B